ভারতের অর্থনৈতিক নীতি এবং মোদির গুজরাট মডেল

মোশাহিদা সুলতানা ঋতু

পর পর দুইবার কংগ্রেসের জয়ের পর ১০ বছরের ব্যবধানে আবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলো ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতৃত্বে কোয়ালিশন, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স। ২০১৪-এর নির্বাচনে এবার বিজেপি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন দান করেছে নরেন্দ্র মোদিকে, যিনি সারা পৃথিবীতে বিতর্কিত হয়েছিলেন ২০০২ সালে গুজরাটে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়। এর আগে ২০০৪ সালে নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিজেপির স্লোগান ছিল 'ইন্ডিয়া শাইনিং'। সে সময় নির্বাচনের বিজয় নিয়ে বিজেপি এতটাই সুনিশ্চিত ছিল যে, নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস আগেই অটল বিহারি বাজপেয়ি নির্বাচন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় বিজেপির আত্মবিশ্বাসের অন্যতম কারণ ছিল 'ইন্ডিয়া শাইনিং' ক্যাম্পেইন, যার কেন্দ্রে ছিল তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা । তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি, কারগিল যুদ্ধ জয়, লাহোর ও আগ্রা সামিটে পাকিস্তানের সাথে আলোচনা, ভারতের সবচেয়ে বড় হাইওয়ে নেটওয়ার্ক নির্মাণ এবং নিউক্লিয়ার শক্তি পরীক্ষা ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্প ও বাস্তবায়নকে সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে হাজির করে বিজেপি যখন এগিয়ে যাচ্ছিল ২০০৪-এর নির্বাচনে জয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে, তখন বাদ সেধে বসেছিল অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যাদের জীবিকার উন্নয়নের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না 'ইন্ডিয়া শাইনিং' ক্যাম্পেইনের চোখ ধাঁধানো উন্নয়ন প্রকল্পের। তাই রাশভারী উন্নয়ন প্রকল্প দিয়ে এক বিলিয়ন মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিজেপি শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

২০১৪-তে মোদির বিজয়ের অন্য অনেক কারণের মধ্যে ছিল কংগ্রেসের দুর্নীতি, মুসলিমদের কংগ্রেসকে নিয়ে আশাভঙ্গ, উন্মুক্ত বাজারব্যবস্থা ও কর্পোরেট আধিপত্যের কারণে সৃষ্ট অনিবার্য মেরুকরণ, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত বৈষম্যের দরুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা। কংগ্রেসকে নিয়ে জনগণের আশাভঙ্গের সাথে সাথে মোদির উদ্ভাবিত সুশাসন তত্ত্ব, উন্নয়ন তত্ত্ব ও তাকে ঘিরে সবার জন্য প্রবৃদ্ধি নিয়ে মিডিয়া ক্যাম্পেইন কিছু হলেও জনগণের মধ্যে নতুন আশার জন্ম দেয় আর তার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয় হয় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের। ২০০৪ সালে বিজেপির অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনই যখন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোট হারানোর অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন ২০১৪-তে বিজেপির পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঠিক কোন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ পূর্বের নীতির চেয়ে নতুন নীতিকে

২০১৪-তে মোদির বিজয়ের অন্য অনেক কারণের মধ্যে ছিল কংগ্রেসের দুর্নীতি, মুসলিমদের কংগ্রেসকে নিয়ে আশাভঙ্গ, উন্মুক্ত বাজারব্যবস্থা ও কর্পোরেট আধিপত্যের কারণে সৃষ্ট অনিবার্য মেরুকরণ, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত বৈষম্যের দরুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা।

আলাদা করেছে বা ঠিক কোন বৈশিষ্ট্যটি জনমনে মোদির উন্নয়ন দর্শনের উপর নতুন করে আস্থা তৈরি করেছে, তা হতে পারে একটি অনুসন্ধানযোগ্য প্রশ্ন। অথবা প্রশ্ন হতে পারে, আদৌ কি নতুন প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে নতুন কোনো সংযোজন বা বিয়োজন দৃশ্যমান, যা ২০০৪-এর আগের নীতি থেকে ২০১৪-এর নীতিকে খুব বেশি আলাদা করতে পারে? এজন্য প্রয়োজন নরেন্দ্র মোদিকে বোঝা, তাঁর তথাকথিত বহুল আলোচিত গুজরাট মডেলের পর্যালোচনা করা এবং গুজরাটে গত ১২ বছর ধরে তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা বিশ্লেষণ করা।

২০১৪-এর নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে বিশাল আকারে তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইনে ব্যবহার করা হয়েছিল। আর এদিকে নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনী প্রচারণায় তাঁর শক্তির জায়গা হিসেবে শুধু হিন্দু জাতীয়তাবাদী অবস্থানকেই বেছে নেননি, বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সুশাসন দর্শন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনকেও। তাঁর এই উন্নয়ন দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রচারিত মোদির তথাকথিত সুশাসন-সক্ষমতা কতটুকু জনগণের প্রকৃত সমর্থনপুষ্ট আর কতটুকু পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের সমর্থনপুষ্ট তা হতে পারে আরেকটি প্রশ্ন।

নরেন্দ্র মোদি ২০০১ সালে প্রথম গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হবার পর থেকে যথাক্রমে ২০০২, ২০০৯ ও ২০১২-তে নির্বাচিত হয়ে গুজরাটে তাঁর উন্নয়ন মডেল প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালীন সময়ে ২৫০০-এরও অধিক মুসলিম প্রাণ হারায়। সে সময় মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং এই দাঙ্গা দমনে কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন না করে এবং কোনো জোরালো অবস্থান না নিয়ে বিশ্বব্যাপী সমালোচিত হন। পরবর্তীতে ২০১৪-এর নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর রাজনৈতিক দল হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির ভারতীয় সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে নগ্নভাবে তাঁর উন্নয়ন দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত করে তার পক্ষে সমর্থন অর্জন করতে সচেষ্ট দেখা যায়। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালীন সময়ে মোদি আসামে বসবাসরত তথাকথিত 'অবৈধ মুসলিম বাংলাদেশি' অভিবাসীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে হঠাৎ সরব হয়ে ওঠেন। উল্লেখ্য, ওই সময় তিনি ভারতীয় শ্রমবাজারে শুধু 'অবৈধ মুসলিম বাংলাদেশি'দের অনুপ্রবেশকেই সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং 'হিন্দু বাংলাদেশি'দের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। এভাবে ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব উস্কে দিয়ে তিনি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিমদের জমি, সম্পদ ও জীবিকা পুনর্দখলের গোপন অভিপ্রায়ের প্রতি নীরব সমর্থন জানিয়ে তাদের ভোট নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

গুজরাটের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নরেন্দ্র মোদির প্রচারণা

২০০২-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর যখন নরেন্দ্র মোদি বিশ্বজুড়ে বিতর্কিত হন তখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নরেন্দ্র মোদির সাথে কূটনৈতিক

সম্পর্ক ছিন্ন করে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দিতে পর্যন্ত অসম্মতি জানায়। সেই একই মোদিকে ২০১২-এর পর থেকে এই দেশগুলো আবার গ্রহণ করতে শুরু করে তাদের নিজ নিজ অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরেই। ২০১৩ সালে গুজরাটের গান্ধীনগরে যে গুজরাট সামিট অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে গুজরাটের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাফল্য সম্পর্কে বলা হয়, ২০১৩-এর আগের পাঁচ বছরে গুজরাটের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ১০.৪%, যা সমগ্র ভারতের গড় ৫% প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি। গুজরাটের অর্থনীতি সম্পর্কে আরো বলা হয় যে সমগ্র ভারতের শিল্পপণ্য উৎপাদনের ১৬% আসে গুজরাট থেকে এবং ভারতের বিনিয়োগের প্রায় ১২.৭% আসে গুজরাটে। গুজরাটের শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ১৩%, কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ১১-১২%, যা সমগ্র ভারতে মাত্র ৩%। ভারতের রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ ২২% গুজরাট থেকে আসে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি ও শিল্প খাত উন্নয়নের জন্য গুজরাট অবকাঠামো উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। গুজরাটে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ছয়টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর, ২৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্র, ১,৩৭,৬১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ, ৫,১৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ ও ২,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস পাইপলাইন রয়েছে। এছাড়া গুজরাটে ২৭ হাজার হেক্টরেরও বেশি এলাকাজুড়ে ৫৫টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন আছে। এর মধ্যে একেকটি বাস্তবায়নের একেক পর্যায়ে রয়েছে। কিছু সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে, কিছু আছে অনুমোদনের প্রক্রিয়ায়। এখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্প এলাকার মধ্যে আছে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক, বন্দরভিত্তিক, বহুপণ্যভিত্তিক, রত্ন ও গয়না, বিদ্যুৎ, টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক ও বায়োটেকনলোজিভিত্তিক পণ্যের শিল্প। শুধু স্পেশাল ইকোনমিক জোনই নয়, নরেন্দ্র মোদির প্রশাসন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে গুজরাটকে ব্যবসাবান্ধব শিল্পকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি হস্তক্ষেপ সীমিতকারী নিয়ম-নীতি চালু করার মাধ্যমে ব্যবসায়ীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দেশি-বিদেশি সব ধরনের বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার সমস্ত আয়োজন অব্যাহত রাখে।

যেই যুক্তরাষ্ট্র ২০০২ সালের পর নরেন্দ্র মোদির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, সেই যুক্তরাষ্ট্র ২০১১ সালে এসে নরেন্দ্র মোদির কর্পোরেটবান্ধব উদ্যোগে আকৃষ্ট হয়ে মোদির অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতির ঘোর সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইউএস কংগ্রেশনাল রিসার্চ তার একটি রিপোর্টে গুজরাটকে ভারতের সুশাসন ও উন্নয়নের সবচাইতে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করে। যুক্তরাষ্ট্র এভাবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনে ও দুর্নীতি দমনে মোদি প্রশাসনের সক্ষমতার সার্টিফিকেট দিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উদাহরণ হিসেবে গুজরাটকে সামনে তুলে ধরে।

২০০১ সালের শুরু থেকে মোদির অর্থনৈতিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বেসরকারিকরণ ও জোগান বৃদ্ধির নীতি প্রণয়নের দিকে ঝোঁক। অর্থাৎ উৎপাদকদের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও সেবা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও চাকরির সুযোগ তৈরি করা। কাজেই যে অর্থনৈতিক নীতি বেসরকারি বিনিয়োগের পথ সুগম করে, সেসব নীতি প্রণয়ণ করেই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব–এটাই ছিল নরেন্দ্র মোদির মূল উন্নয়ন দর্শন। সেক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পক্ষে নীতি প্রণয়ন, ব্যবসায়ীদের মুনাফা লাভের পথ সুগম করে দেয়া, উৎপাদকদের উপর প্রদত্ত কর কমানো, কর্পোরেশনের কাছে বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি সহজলভ্য করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল যোগাযোগ সম্প্রসারণ। এগুলো ছাড়াও বড় বড় কর্পোরেশনকে আরো বিবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে নরেন্দ্র মোদি দানবীয় কর্পোরেশনগুলোর প্রিয়ভাজন হয়েছেন, আর পরবর্তীতে এই কর্পোরেটদের অর্থ ব্যবহার করেই ২০১৪-এর নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। সাধারণ মানুষকে প্রচারণায় বোঝানো হয়েছে, কিভাবে এসব নীতি কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে নতুন নতুন চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম এবং কিভাবে এই প্রবৃদ্ধি সব শ্রেণির জন্যই উন্নয়ন বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

এদিকে গুজরাট যখন স্বাস্থ্য চিকিৎসার একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এই উল্লিখিত ১২ বছরের মধ্যে, তখন এই ১২ বছরে গুজরাটের স্বাস্থ্য উন্নয়ন সূচক বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ২৫% এবং গুজরাটের চাইতে এগিয়েছিল আরো ৮টি রাষ্ট্র।

কিন্তু ২০০৪-এর নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছি, বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের অঙ্গীকার ও জীবিকার সুযোগ তৈরির প্রতিশ্রুতি জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেনি; আর তাই ২০১৪ সালে বিজেপি স্লোগানের সুর পাল্টিয়ে মূল স্লোগান ঠিক করে 'আব কি বার, মোদি সরকার' অর্থাৎ 'এইবার, মোদি সরকার'। এর উদ্দেশ্য মোদির ১২ বছরে প্রতিষ্ঠিত বহুকথিত উন্নয়ন মডেলকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান। কারণ ইতোপূর্বে মোদি গুজরাটে তাঁর উন্নয়ন দর্শনে 'ভারত সবার আগে' অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব উন্নয়নের পেছনে ভারতের জাতীয় স্বার্থকে অধিক গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করে এসেছেন। ২০১৪-এর নির্বাচনী প্রচারণায় জায়গা করে নেয়া অনেক ধরনের স্লোগানের ভিড়ে একটি গান মিডিয়া ক্যাম্পেইনে ব্যবহার করা হয়, যার প্রধান বক্তব্য হলো, 'ভালো দিন আসছে'। এবং তা করতে গিয়ে মোদি বিভিন্ন বক্তব্য ও ভাষণে গুজরাটের অর্থনৈতিক মডেলকে একটি 'সবার জন্য প্রবৃদ্ধি' মডেল (Inclusive growth model) হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে গুজরাটের মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) আসলে কী বলে? ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০১১-২০১২, এই ১২ বছরে ভারতের গড় মানব উন্নয়ন সূচক যখন পুরো ভারতে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪৬%, তখন গুজরাটে তা বেড়েছিল ৪৪%। যে ১১টি রাজ্য মানব উন্নয়ন সূচক বৃদ্ধিতে এগিয়ে ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল উত্তরাঞ্চল (৮২%), ঝাড়খণ্ড (৭৬%), মধ্য প্রদেশ (৬৪%), উত্তর প্রদেশ (৬১%)। ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০১১-২০১২, ১২ বছরে শিক্ষা খাতে উন্নয়ন সূচক গুজরাটে বেড়েছিল ৪৩%, যখন পুরো ভারতে বেড়েছিল ৬২%, এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করলে গুজরাট ছিল ১৮তম অবস্থানে। ঐ একই সময় শিক্ষা খাতে উন্নয়ন সূচক বেড়েছিল ঝাড়খণ্ডে ১৩৯%, কর্ণাটকে ৬২%, উত্তরাঞ্চলে ১২১%, মধ্য

প্রদেশে ৮৩% ইত্যাদি। এদিকে গুজরাট যখন স্বাস্থ্য চিকিৎসার একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এই উল্লিখিত ১২ বছরের মধ্যে, তখন এই ১২ বছরে গুজরাটের স্বাস্থ্য উন্নয়ন সূচক বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ২৫% এবং গুজরাটের চাইতে এগিয়েছিল আরো ৮টি রাজ্য।

মানব উন্নয়ন সূচক ছাড়াও গুজরাটে শ্রমিকদের মজুরি পুরো ভারতের শ্রমিক মজুরির সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, এখানে মজুরি সর্বনিম্ন মজুরির তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পুরো ভারত থেকে এগিয়ে থাকলেও সর্বনিম্ন মজুরি দেয়াতে এগিয়ে আছে গুজরাট। India Labour and Employment Report ২০১৪ অনুসারে ২১টি রাজ্যের তুলনাচিত্র এনে দেখা গেছে যে, শ্রমিক কর্মসংস্থান অবস্থার দিক থেকে গুজরাট ১২তম অবস্থানে রয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, এই প্রবৃদ্ধির সুফলভোগী আসলে কারা (Outlook India 2014)।

নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন দর্শন

নরেন্দ্র মোদি তাঁর নিজস্ব উন্নয়ন দর্শনকে জনগণের সামনে সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের জনপ্রিয় দর্শন, আদর্শ ও মিথোলজির আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন–হিন্দু ধর্মে মা কালীকে বিশ্বজগতের অফুরন্ত শক্তির আধার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তেমনি নরেন্দ্র মোদি বিশ্বজগতের সমস্ত উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পাঁচটি প্রধান শক্তিকে পাঁচটি উন্নয়নের স্তম্ভ বলে মনে করেন। তাঁর মতে, পানিসম্পদ উন্নয়ন হলো জলশক্তি, জ্বালানি উন্নয়ন হলো উর্জশক্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো জনশক্তি, শিক্ষা উন্নয়ন হলো জ্ঞানশক্তি, নিরাপত্তা হলো রক্ষাশক্তি। এই পাঁচটি শক্তির অবিরাম প্রবাহ এবং এর যথোপযুক্ত ব্যবহারই উন্নয়নের অন্তর্নিহিত শক্তির ধারাবাহিকতা বলে মনে করেন তিনি। এভাবে উন্নয়নের সাথে হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতির সংযোগ ঘটিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর উন্নয়ন ধারণাকে বোধগম্য করার চেষ্টা করেন।

জলশক্তি, উর্জশক্তি, জনশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও রক্ষাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে আবর্তিত হয়েছে নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন দর্শন। কিন্তু তাঁর গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সত্যিকার অর্থে সব শ্রেণির মানুষের উন্নতি সাধন করতে পেরেছে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। যেমন–পানিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে সরদার সরোবর ড্যাম বা বহুল আলোচিত নর্মদা ড্যাম প্রজেক্ট, যার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে ভারতীয় জনগণ। এই ড্যামের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ হলো, এই ড্যাম তৈরি হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই, যাদেরকে উচ্ছেদ করে, জীবিকা ধ্বংস করে নির্মাণ করা ড্যাম বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে অন্য অঞ্চলে। তাছাড়া এর কারণে বিশাল অঞ্চলের ইকোলজি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদিও এর উচ্চতা বৃদ্ধি প্রকল্প এখন পর্যন্ত স্থগিত অবস্থায় আছে, নরেন্দ্র মোদি এই ড্যামের উচ্চতা বৃদ্ধির পক্ষে কাজ করে চলেছেন নিরলসভাবে। শোনা যাচ্ছে, এই উচ্চতা বৃদ্ধির প্রকল্প শুরু হতে যাচ্ছে আবার। তাছাড়া মাটির গভীর থেকে পানি

মোদি পানি ব্যবস্থাপনার সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে যুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অধিকতর বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়লেও এর সাথে বেড়েছে বিদ্যুতের দাম। আর এই ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি অসুবিধায় পড়েছে সবচাইতে হতদরিদ্র মানুষ। উল্লেখ্য, গুজরাটে বিদ্যুতের মূল্য ভারতের অন্য সব অঞ্চলের চেয়ে বেশি। এর কারণ হলো গুজরাটের বেশিরভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বেসরকারি কোম্পানি দ্বারা।

উত্তোলনের কারণে যেখানে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, তখন এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে জনপদ এবং জনস্বাস্থ্য পড়ছে ঝুঁকির মুখে। এমন অবস্থায় সরকার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না রেখেই মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ২০১৩ সাল থেকে। অথচ ২০১২ সালে সরকার কোকা-কোলা কোম্পানিকে ভারতের সবচাইতে বড় প্লান্টটি নির্মাণ করে কোনো শর্ত ছাড়াই চালু করার অনুমতি দেয়। কোকা-কোলা যেখানে মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন করে ব্যবসা করার অধিকার রাখে, সেখানে গুজরাটের কৃষক, যাদের এর মাটি-পানির উপর অধিকার সবচেয়ে বেশি, তাদেরকে দেখা গেল পানি উত্তোলন করতে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। নগ্নভাবে কর্পোরেশনের কাছে যে নরেন্দ্র মোদি তাঁর রাষ্ট্রের মাটি-পানি এভাবে বিকিয়ে দেন, তখন তাঁর উন্নয়ন দর্শনের 'জলশক্তি' আসলে কার স্বার্থ রক্ষা করে তা তাঁর উন্নয়ন মডেল পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয়।

মোদি পানি ব্যবস্থাপনার সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে যুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অধিকতর বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়লেও এর সাথে বেড়েছে বিদ্যুতের দাম। আর এই ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি অসুবিধায় পড়েছে সবচাইতে হতদরিদ্র মানুষ। উল্লেখ্য, গুজরাটে বিদ্যুতের মূল্য ভারতের অন্য সব অঞ্চলের চেয়ে বেশি। এর কারণ হলো গুজরাটের বেশিরভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বেসরকারি কোম্পানি দ্বারা। এবং এইসব বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বেশি মূল্যে আমদানীকৃত কয়লা থেকে। গ্রিন ক্লিন গাইড ২০১৩-এর হিসাব অনুযায়ী, গুজরাটের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩,৯২৭ মেগাওয়াট, যা সম্পূর্ণ ভারতের উৎপাদন ক্ষমতার ৪৬% বলে উল্লেখ করা হয়। আবার ভারতের ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালে গুজরাটের উৎপাদন ক্ষমতা সমগ্র ভারতের উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ১১%। এই সমস্ত তথ্যবিভ্রাট প্রমাণ করে, এই উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে-বাড়িয়ে দেখানোর পেছনে অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করে। গ্রিন ক্লিন গাইডে এও বলা হয় যে, গুজরাটে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয় তার ৪০.৮% আসে বিদ্যুৎ খাতে।

নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার আগে যে গুজরাটে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের জোগান অনেক কম ছিল, সেই গুজরাট মোদি সরকারের উদ্যোগের কারণে বিদ্যুৎ ঘাটতির রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ আধিক্যের রাজ্যে পরিণত হয়। এ ধরনের সাফল্যের প্রচারণা স্বাভাবিকভাবেই জনগণের মনে মোদির উপর আস্থা বাড়িয়ে তুলেছে ধীরে ধীরে। কিন্তু যেসব প্রশ্ন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনে চিরস্থায়ী কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি তা হলো এইসব বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুফল আসলে শেষ পর্যন্ত কাদের কাছে পৌঁছায়? প্রথমত বেসরকারি এইসব বিনিয়োগকারীর মধ্যে রয়েছে টাটা পাওয়ার, রিলায়েন্স পাওয়ার এবং আদানি গ্রুপ। গুজরাট সরকার উৎপাদন বৃদ্ধি ও এইসব বেসরকারি কোম্পানিকে ব্যবসায় বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির অজুহাতে গুজরাটের জমি

পানির দরে বিক্রি করে দিয়েছে। এইসব জমি অধিগ্রহণের সময় অনেক কৃষক তাদের যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করা চাষের জমি পানির দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। যখন মোদির বিদ্যুৎ খাতে অবদানের সাফল্য ফলাও করে প্রচার করা হয়, তখন যে বিষয়টি দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় তা হলো এত বিদ্যুৎ উৎপাদন সত্ত্বেও গ্রামে সেচকাজের সময় লোডশেডিং কেন হয়? বড় শহরগুলোতে যেখানে বিদ্যুতের বাণিজ্যিক ব্যবহার বেশি এবং যেখানে বাড়িঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় সেসব শহরে কখনো লোডশেডিং হয় না। লোডশেডিং হয় সেসব জায়গায় যেখানে কৃষকরা বিল পরিশোধে অনিয়মিত কিংবা যেখানে বিল পরিশোধের সম্ভাবনা কম। জোর করে জমি কম দামে কৃষকের কাছ থেকে কিনে নেয়া, আবাদি জমি বাণিজ্যিক প্রকল্পে ব্যবহার করে কৃষি খাত সংকোচন করা, লোডশেডিংয়ে বৈষম্য, সেচকাজের অসুবিধা, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি–এইসব অভিযোগ তথাকথিত চাকরির সুযোগ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতির ঢাকঢোলে আড়াল হয়ে গেছে।

নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন মডেলের আরেকটি সফলতা হিসেবে হাজির করা হয় কৃষি খাতে গুজরাটের উন্নয়ন। নরেন্দ্র মোদি দাবি করেন যে, গুজরাটে পানিসম্পদ উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে কৃষকরা লাভবান হয়েছে এবং সে কারণে গুজরাটে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ১০.৯৭%, যেখানে সারা ভারতে মাত্র ৩%। কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে ২০০৭-২০১২-তে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৪.৮%। শুধু তা-ই নয়, হাইব্রিডের অবাধ ব্যবহার, অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, সেচকাজে বিদ্যুৎ সরবরাহে লোডশেডিং, উচ্চসুদে কৃষিঋণ প্রদান–সবকিছুর কারণে উৎপাদন খরচ এত বেশি বেড়ে গেছে যে, উৎপাদন বাড়লেও সেই অনুপাতে কৃষকের আয় বাড়েনি। তাছাড়া তুলাকে রফতানিজাত কৃষিপণ্য হিসেবে গণ্য করে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তুলাচাষিরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকে। অতিরিক্ত উৎপাদন খরচ ও সে অনুযায়ী আয় না হওয়ায় অনেক কৃষক আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়েছে। নিউজ রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৩ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ৪৮৯ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে, ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১১২ জন আত্মহত্যা করেছে এবং শুধু ২০১২-এর আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৪০ জন কৃষকের আত্মহত্যার খবর পাওয়া যায় (Katakam 2013)। এসব ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ভারতের অন্য যে কোনো রাষ্ট্র অথবা আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্য সকল রাষ্ট্র বা শহর যা যা সমস্যার সম্মুখীন হয় তার থেকে গুজরাটকে আলাদা করা যায় না। বরং বলা যায়, বড় বড় বীজ বিক্রয়কারী কর্পোরেশন, যেমন–মনসান্টোর মতো বহুজাতিক কোম্পানিকে ব্যবসা করতে দেয়ার জন্য সকল দুয়ার উন্মুক্তকরণে নরেন্দ্র মোদির তুলনা নেই।

২০১২ সালের ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ সালে গুজরাটের গ্রামের জনসংখ্যা কমেছে ৩৬.৯ লাখ। আর এদিকে একই সময়ের মধ্যে শহরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার। এখানে মানুষ শহরমুখী হয়েছে। কেউ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে গেছে, কেউ গুজরাটের মধ্যেই গ্রাম থেকে শহরে গেছে জীবিকার উদ্দেশ্যে। আন্তরাজ্য অভিবাসন একটি জটিল প্রক্রিয়া। উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে যদিও বোঝার উপায় নেই যে কে ঠিক কোথায় অভিবাসন করেছে, কিন্তু যখন ৩৬.৯ লাখ মানুষ গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন করে পাঁচ বছরের ব্যবধানে, তখন বুঝতে হবে শহর উন্নয়নমুখী নীতি এই অভিবাসনের কারণ। তাছাড়া শহরে দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়াও বোঝায় যে গ্রামের উদ্বৃত্ত শ্রম শহরে কাজের সন্ধানে গিয়ে স্বল্প মজুরিতে শ্রমবাজারে প্রবেশ করে বাজারে মজুরি কমিয়ে দেয়। আর এর ফলে দারিদ্র্য বেড়ে যায়। উন্মুক্ত বাজার নীতি ও জোগান বৃদ্ধির অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণকারী বেশিরভাগ শহরে এই প্রবণতা কমবেশি বিদ্যমান। এতে প্রমাণিত হয় যে, নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন মডেল ও সবার জন্য প্রবৃদ্ধির দাবি প্রকৃত অর্থে অন্য কোনো রাষ্ট্রের অবস্থার চাইতে খুব বেশি আলাদা নয়। কাজেই গুজরাটকে যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে নরেন্দ্র মোদির গুণগান করেছে তার সাম্প্রদায়িক অতীতকে স্মৃতি থেকে তুলে দিয়ে, তাতে উপকৃত হবে শুধু বড় বড় কর্পোরেশন, যারা সরকারের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করবে গরিবের জমি দখল ও পণ্যের দাম বাড়ানোর মধ্য দিয়ে।

নরেন্দ্র মোদির সুশাসন দর্শন : 'সরকার সংকোচন করো, সুশাসন বিস্তার করো'

নরেন্দ্র মোদি যখন বলেন "Less government, more governance", তখন মনে হতে পারে, তিনি একটি সরকারের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর কথা বলছেন। কিন্তু আসলে তিনি যা বোঝাচ্ছেন তা হলো সরকার যেহেতু অদক্ষ, কাজেই সরকারের আকার ছোট করে, বেসরকারি খাতে যথাসম্ভব সরকারের হস্তক্ষেপ কমিয়ে, আমলাতন্ত্র হ্রাস করে, বিনিয়োগের সুবিধা বাড়িয়ে, বেসরকারীকরণকে উৎসাহ প্রদান করলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর এই দর্শন প্রকৃতপক্ষে নয়া উদারতাবাদী দর্শনের ভারতীয় সংস্করণ। কংগ্রেসের ব্যর্থতার সুযোগে কথার মারপ্যাঁচে জনগণকে অভিভূত করার কৌশল ছাড়া এই দর্শন আসলে নতুন কিছু নেই।

নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে আদানি গ্রুপকে প্রতি বর্গমিটার জমি ১ রুপি থেকে ৩২ রুপিতে বিক্রি করেছেন, যেখানে এই জমির বাজারমূল্য ছিল ১৫০০ রুপি। আদানি গ্রুপ সেই জমি যখন প্রস্তাবিত শিল্প-কারখানা ও বন্দর নির্মাণের কাজে ব্যবহার না করে অন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দিল, তখন স্থানীয় জনগণ তার প্রতিবাদ করলেও এর কোনো সুরাহা হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই যদি হয় সরকারের ভূমিকা, তাহলে সরকারকে সংকোচন করলে আসলে কার লাভ? সরকার যত ছোট হবে, সরকারের কর্তৃত্ব যত কম হবে, তত বেশি সুবিধা ভোগ করবে কতিপয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, যাদের উপর নির্ভর করেই মোদিদের মতো রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় টিকে থাকার আয়োজন করেন।

গুজরাটের মোদি সরকার আহমেদাবাদের অদূরেই সানান্দ নামে একটি স্থানে কৃষি গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত ৪৪০ হেক্টর জমি টাটাকে ন্যানো ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট নির্মাণের জন্য প্রদান করে। কিন্তু এই জমি যথেষ্ট না হওয়ায় এর আশেপাশে আরো ৫২০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রায় সাতটি গ্রামের জমি অধিগ্রহণ করে জবরদস্তি করে। যেহেতু পরিকল্পনা ছিল সানান্দকে একটি অটোমোবাইল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে টাটা, ফোর্ড, পিউজো, মারুতি, সুজুকির মতো বড় কোম্পানির জন্য অধিগ্রহণ করা এই জমির পেছনে ছিল একটি বড়

রাজনৈতিক নকশা, যার পরিকল্পনা অনেক আগেই করা হয়ে গেছে। এছাড়া মান্দ্রাতে ১০ হাজার হেক্টর জমিজুড়ে বিস্তৃত স্পেশাল ইকোনমিক জোনে বন্দর নির্মাণ করতে গিয়ে মোদি সরকার ৫৬টি গ্রাম থেকে জেলেদের উৎখাত করে ও বন অধিকার আইন ভঙ্গ করে ২০০০ হেক্টরের উপর বন উজাড় করে দেয়।

অটোমোবাইল, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ম্যানুফ্যাকচারিং হাব বা কেন্দ্র হিসেবে ইতোমধ্যে পরিচিত গুজরাট আরো একটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তা হলো আন্তর্জাতিক মানের বেসরকারি স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি করতে গুজরাটে নির্মিত হয়েছে বড় বড় কর্পোরেট হাসপাতাল, যেগুলো চড়া মূল্যে স্বাস্থ্য সুবিধা বিক্রি করে থাকে। যদিও এইসব হাসপাতাল বানানোর সময় এর উদ্দেশ্যকে জনহিতকর বলে প্রচার করা হয়, আদতে এখানে দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা আসে ব্যয়বহুল চিকিৎসাসেবা নিতে। আসলে গুজরাটের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর সুফল পায় না।

নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক নীতি: মনমোহন সিং এর নীতিরই ধারাবাহিকতা

১৯৯১ সালে মনমোহন সিং নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার আগে তাঁর রাজনীতিতে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার সময় তিনি ভারতের সংরক্ষণবাদী বাণিজ্যনীতিকে সমালোচনা করে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ঐ সময়ে ওয়াশিংটন কনসেনসাস এবং রিগ্যান ও মার্গারেট থ্যাচারের উদারনীতি অনুসরণের কারণে উদার অর্থনৈতিক নীতি বিশ্বব্যাপী নতুন মাত্রায় সমাদৃত হতে শুরু করেছিল। তাই মনমোহন সিংয়ের উদার অর্থনৈতিক নীতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব নব্বইয়ের দশকে ভারতের উচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি ও বাজেট ঘাটতির মুখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। উদার অর্থনৈতিক নীতি তখনকার সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান না হলেও একটি দ্রুত সমাধানের পথ হিসেবে দ্রুতই জনপ্রিয়তা লাভ করে। কারণ এই উদার অর্থনৈতিক নীতির সাথে জড়িত ছিল কর্পোরেট মহলের লুক্কায়িত স্বার্থ ও দ্রুত অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভ করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। একজন টেকনোক্র্যাট হিসেবে মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রী হয়ে আসার পর তিনি যেসব সংরক্ষণবাদী অর্থনৈতিক নীতি তখনো ভারত সরকার বর্জন করতে পারেনি, সেগুলোকে অনেক বিতর্কের মুখে পড়েও পরিবর্তন করতে শুরু করেন। কারণ তখনো তাঁর পেছনে শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল স্বার্থান্বেষী কর্পোরেট মহল। তাছাড়া বাণিজ্য ঘাটতি থেকে পরিত্রাণের জন্য আইএমএফের প্রদত্ত শর্ত পালন করা ছাড়া আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সবকিছু মিলে বাম রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আসা বাধাকে উপেক্ষা করে মনমোহন সিং নব্বইয়ের দশকে 'লাইসেন্স রাজ' বাতিল করেন। 'লাইসেন্স রাজ' ছিল বেসরকারি ব্যবসা বা বিনিয়োগে সংরক্ষণবাদী আইন-কানুন, যা বেসরকারি ব্যবসার উপর সরকারের কর্তৃত্ব বলবৎ রাখে। এর উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারি খাতে দুর্নীতি ও শোষণের পথ বন্ধ করা। যদিও ১৯৮০-র দশকের শেষের দিক পর্যন্ত এই লাইসেন্স রাজের অনেক নিয়ম-কানুন শিথিল করা হয়েছিল, ১৯৯১-এ মনমোহন সিং সরকারের নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে নতুনভাবে উদারনীতি অনুযায়ী কর্পোরেটবান্ধব ও বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব শর্ত আরোপ করেন।

প্রকৃতপক্ষে গুজরাটে নরেন্দ্র মোদির সকল অর্থনৈতিক নীতি মনমোহন সিংয়ের দ্বারা শুরু করে যাওয়া অর্থনৈতিক নীতির ধারাবাহিক রূপ। অথবা বলা যেতে পারে, ক্ষেত্রবিশেষে এর বর্ধিত রূপও। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেই নরেন্দ্র মোদি সরকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক নীতি পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা বাজেটে ব্যক্ত করে।

সেজন্য প্রকৃতপক্ষে গুজরাটে নরেন্দ্র মোদির সকল অর্থনৈতিক নীতি মনমোহন সিংয়ের দ্বারা শুরু করে যাওয়া অর্থনৈতিক নীতির ধারাবাহিক রূপ। অথবা বলা যেতে পারে, ক্ষেত্রবিশেষে এর বর্ধিত রূপও। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেই নরেন্দ্র মোদি সরকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক নীতি পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা বাজেটে ব্যক্ত করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, কর্পোরেটবান্ধব করনীতি। নরেন্দ্র মোদি ২০১৪-এর আগস্টে রেলওয়ের উপর বিদেশি বিনিয়োগের সীমা উঠিয়ে দিয়ে ১০০% পর্যন্ত করেন, প্রতিরক্ষা খাতে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ২৬% থেকে উঠিয়ে ৪৯% করেন, বীমা খাতেও সীমা ২৬% থেকে উঠিয়ে ৪৯% করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, নব্বইয়ের দশক থেকে মনমোহন সিং যেসব অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রথম উদার অর্থনৈতিক নীতি বা কট্টর পুঁজিবাদী নীতি অনুসরণের পথ সুগম করে দিয়ে গেছেন। এবং এর পর থেকে জাতীয় পর্যায়ে শুধু কংগ্রেসই নয়, বিজেপিও ক্ষমতায় থাকাকালীন সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেই অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন করে গেছে। নরেন্দ্র মোদি গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময় যথাসম্ভব এই বলয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছেন। একে একে বাস্তবায়ন করে গেছেন কর্পোরেট মদদপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প। এখন নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনের পরে একই ধারায় জাতীয় পর্যায়ে আরো আগ্রাসী ভূমিকার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন।

নরেন্দ্র মোদি প্রশাসন ও বাংলাদেশ

নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এসেই প্রথমে বাংলাদেশ বিষয়ে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন বাজেটের অংশ হিসেবে বা কূটনৈতিক সম্পর্কের জায়গা থেকে, সেগুলো হলো– ১. সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া আধুনিকীকরণ। এর জন্য মোদি সরকার ইতোমধ্যে ২০১৪-এর বাজেটে ২২৫০ কোটি রুপি বরাদ্দ রেখেছেন। ২. আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ১০০ কোটি রুপি বাজেট বরাদ্দ। ৩. তিস্তা চুক্তি নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু হলেও তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি মৌখিকভাবে সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ ছাড়া। ৪. ভারত বাংলাদেশের নদীপথ ও আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরায় খাদ্যশস্য পাঠানো শুরু করেছে। এর জন্য বাংলাদেশে কোনো অবকাঠামো উন্নয়ন বা সংস্কারের প্রয়োজন হলে ভারত তা নিজের খরচেই করে দেবে বলে জানিয়েছে। বাস্তবে তাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েই এসব কাজ অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কোনো ট্রানজিট ফি বা অন্য কোনো মাসুলের

লেনদেন হবে কি না, তা নিয়ে জানা যায়নি। ৫. বাংলাদেশের সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান আদানি গ্রুপ। ৬. নির্বাচনের সময় গ্রুপ বাংলাদেশি অভিবাসীদের (যাদের আসল পরিচয় ভারতীয় না বাংলাদেশি এ নিয়ে নানান ধরনের সংশয় রয়েছে) বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য বাংলাদেশিদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, যার রেশ এখনো বিদ্যমান।

বোঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান কংগ্রেসের শাসনামলে যা ছিল, বিজেপির নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের ক্ষেত্রেও তা-ই থাকবে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে বিবেচনা করলে অবশ্য ভারত চাইবে তার বৃহৎ কর্পোরেট গ্রুপগুলোকে বাংলাদেশে ব্যবসা করার অবাধ সুযোগ তৈরি করে দিতে। কংগ্রেস শাসনাধীন সরকার এই এই নীতি নিয়ে সুন্দরবনধ্বংসী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। মোদি সরকার এসব ক্ষেত্রে অভিন্ন ভূমিকাই পালন করবে।

নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক নীতি

নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন দর্শন ও সুশাসন দর্শন থেকে কয়েকটি বিষয় খুব পরিষ্কার করেই বলা যায় যে, উদারীকরণ নীতির বাইরে গিয়ে নতুন কিছু নরেন্দ্র মোদি করেননি। তাঁর সবচাইতে বড় শক্তির ভারকেন্দ্র হলো দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি, যারা দোসর হিসেবে সব সময় তাঁর উন্নয়ন দর্শন পাঠে হাততালি দিয়ে গেছে ও যাবে। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার আগে ও পরে সব সময়ই বহুল আলোচিত হয়েছেন তাঁর গুজরাট মডেলের জন্য। নরেন্দ্র মোদির ১২ বছরে গুজরাটে যে উন্নয়ন করেছেন বলে ভারত এবং সারা বিশ্বের কাছে প্রচার করা হয়েছে তা বিশ্বব্যাপী নব্য উদারীকরণ নীতি অনুসরণেরই একটি দৃষ্টান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে যেমন চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি নির্বাচনী প্রচারে একটি বড় ভূমিকা রাখে, তেমনি নরেন্দ্র মোদি সব উন্নয়ন প্রকল্পের পেছনে চাকরি বৃদ্ধির সুযোগকে বড় করে উপস্থাপন করেছেন। নতুন চাকরি অবশ্যই তৈরি হয়েছে, কিন্তু কত লাখ লাখ কৃষক ও জেলের জীবিকা ধ্বংসের বিনিময়ে, সে হিসাব নিয়ে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণি হয়তো তেমন চিন্তিত নয়। রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক মনোযোগী হওয়া, কৃষি খাত উদারীকরণ, বহুজাতিক কোম্পানির উপর বীজ, সার, কীটনাশকের জন্য নির্ভরতা বৃদ্ধি, ভোক্তা চাহিদার দিকে নজর না দিয়ে উৎপাদকদের জোগান বৃদ্ধিতে অধিক মনোযোগ দেয়া, বেসরকারি উদ্যোগের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, বিদেশি পুঁজির জন্য অর্থনীতি উদারীকরণ, পানি-বিদ্যুৎ-যোগাযোগ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা বেসরকারীকরণ, তেলের মূল্যবৃদ্ধির চাপ ভোক্তার উপর চাপিয়ে দেয়া, জনকল্যাণে ভর্তুকি হ্রাস ইত্যাদি অর্থনৈতিক নীতির বাইরে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি তাঁর ১২ বছরের গুজরাট মডেল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আর কিছু করেননি। বিজেপির ২০০৪ ও ২০১৪-এর স্লোগানে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই।

মোশাহিদা সুলতানা: লেখক, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইমেইল: moshahida@gmail.com

তথ্যসূত্র :

Marino Andz (2014) Narendra Modi, a Political Biography

Vibrant Gujarat Official Site. Accessed on August 2014. http://www.vibrantgujarat.com/images/pdf/Manufacturing-Sector-Profile.pdf

Gupta, A (2013) "Price of Development in Gujarat under Narendra Modi: An exploration of his model Of growth and governance" Thesis Submitted to European Peace University

Katakam A (2013) Gujarat's Growth: Hype and Hard Facts, Frontline, March 3 2013 http://www.frontline.in/the-nation/hype-and-hard-facts/article4430923.ece

Ghosh Jyoti, Outlook India, September 10 2014 http://www.outlookindia.com/news/article/Wages-in-State-2nd-Lowest-in-India-Economist-Slams-Gujarat-Model/859268

India Labor Employment Report 2014

Human Development Report 2012

Human Development Report 2000